সপ্তদশ লোকসভায় শাসক জোটের প্রত্যাবর্তন, পর্যুদস্ত বিরোধীরা। চারটি দৃষ্টিকোণ

এই সময়

কথাসরিৎ

এতবড়ো একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধতার প্রতিকূলে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে, এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশ

দেওয়াল-লিখনটি এর থেকে স্পষ্টতর হতে পারে না। সারা দেশ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তাদের নেতৃত্বাধীন জোটকে অভূতপূর্ব সমর্থন জানিয়ে আরও পাঁচ বছরের জন্য শাসনভার তাদের হাতেই অর্পণ করেছে। বস্তুত ২০১৯-এর জয়টি এনডিএ জোটের কাছে ২০১৪-র তুলনায় অধিক তৃপ্তিদায়ক, কারণ সরকারে থাকার ফলে যে সমস্যাগুলি সাধারণত শাসক জোটকে মোকাবিলা করতে হয়, সে সবই প্রায় হেলায় উড়িয়ে পেরেছে তারা। নির্বাচনী প্রচারপর্বে দুই যুযুধান পক্ষ সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করেছিল। ভারতীয় জনতা পার্টির রণকৌশলের ভিত্তি ছিল জাতীয় সুরক্ষায় মোদী সরকারের অবদান। অন্য দিকে, কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দল জোর দিয়েছিল অর্থনৈতিক সংকটের উপর। বিস্তৃত বিশ্লেষণ ছাড়া স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠিন হলেও, অনুমান অসঙ্গত হবে না যে নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে বালাকোট-কাণ্ডটিও ভোটের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে অনেকটাই সাহায্য করেছে। কিন্তু স্রেফ সেটি দিয়ে জয়ের এই বিপুল ব্যবধানের ব্যাখ্যা করা কঠিন। স্বচ্ছ ভারত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা কিংবা উজালা প্রকল্পের মতো জনকল্যাণমুখী কর্মসূচিও যে এনডিএ সরকারের প্রত্যাবর্তনের পিছনে অন্যতম কারণ, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেতেই পারে। তৃতীয় কারণটি অবশ্যই একটি বিশ্বাসযোগ্য ঐক্যবদ্ধ জোট গঠনে বিরোধী পক্ষের ব্যর্থতা।

বিজেপি দ্বিতীয় বার প্রতিদ্বন্দ্বিতাটিকে মোদী-কেন্দ্রিক করে তুলতে সফল। এবং সেই নিরিখে বিরোধীপক্ষ জনপ্রিয়তায় তাঁর সমকক্ষ কোনও নেতা বা নেত্রীকে নির্বাচকদের সামনে হাজির করতে ব্যর্থ। এটি স্পষ্ট যে রাহুল গান্ধী এখনও বিকল্প প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নন। নেতৃত্বশূন্যতা যদি একটি কারণ হয়, অন্যতম কারণ বিরোধীপক্ষের অভ্যন্তরেই নানাবিধ ফাটল। বিজেপি একক ভাবে যথেষ্ট বলশালী হওয়া সত্ত্বেও দ্রুত গতিতে একাধিক রাজ্যে জোট গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। অন্য দিকে যাদের জন্য জোট গঠন জরুরি ছিল এই ভোটে, সেই বিরোধী পক্ষ যতটা গর্জেছে, ততটা বর্ষায়নি। যখন বর্ষেছে, তখনও তাদের বক্তব্যে কোনও সম্মিলিত ঐক্যের ছবি ফোটেনি। অর্থাৎ, একাধিক রাজ্যে বিরোধী দলগুলি নিজস্ব দলীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার দরুণ তার সুফলটি পেয়েছে বিজেপি। সাধারণ নাগরিকের প্রশ্ন যদিও আপাতত একটিই। যে দায়িত্ব তারা শাসক দলের উপর পুনরায় ন্যস্ত করেছে, আগামী পাঁচ বছর সেটি পূরণে বিজয়ী দল কতটা তৎপর ও আন্তরিক হবে? সে দিকেই নজর রাখবে সারা দেশ।

রাজ্য

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্মরণীয় হয়ে থাকার অনেকগুলি কারণের মধ্যে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হয়তো এই যে এ বছরের লোকসভা নির্বাচনে এ পার বাংলায় বেশ কিছু পদ্মের সমাহার। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন ঘটনা অভূতপূর্ব। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি আসন বিজেপি না পেলেও, তাদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণেই নিহিত ছিল একটি আভাস। বঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে তাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের আভাস। অতঃপর, এ বারের লোকসভা ভোটে তাদের বর্ধিত আসন সংখ্যায় সেই আভাসটিই বাস্তবে রূপায়িত হল। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এ বারের ভোটে পশ্চিমবঙ্গে বামেদের অবলুপ্তি। গত ৩৪ বছর ধরে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশ যাদের অঙ্গুলি হেলনে চালিত হয়েছে, দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন দশক বিস্তৃত ছিল যাদের জমানা, এই নির্বাচনে স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তারা কার্যত প্রত্যাখ্যাত। রাজ্যের রাজনৈতিক চালচিত্রে বর্তমানে কংগ্রেসের অবস্থানও নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর। কোনও রকমে প্রান্তিক দশায় নিজস্ব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে তারা। ফলে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এই জনাদেশের পরে একটি নতুন দিশার দিকে ধাবিত, যেখানে মুখ্য দুই যুযুধান হিসাবে বিদ্যমান দু'টি ফুল। জোড়াফুল এবং পদ্ম।

অসংখ্যা

৩১৮৩৩২৫

(একত্রিশ লক্ষ তিরাশি হাজার তিনশো পঁচিশ)— ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বৃহত্তম কেন্দ্র মালকাজগিরির মোট ভোটার সংখ্যা

দিনকেদিন

২৪ মে

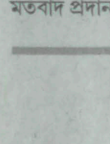

১৫৪৩: জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপারনিকাস ৭০ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তিনিই প্রথম আধুনিক সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের মতবাদ প্রদান করেন।

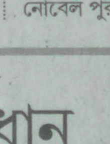

১৯৪১: মার্কিন সঙ্গীতকার ও গায়ক বব ডিলান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম রবার্ট অ্যালেন জিমারম্যান। ২০১৭-এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি।

বিধান

অক্ষয়কুমার দত্ত

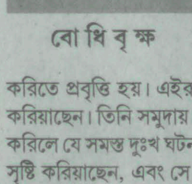

বোধিবৃক্ষ

কিন্তু পরে যদি শুনি, ঐ বালকের উরুদেশে একটি বিস্ফোরণ হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহাতে অস্ত্র করিতেছে, সে এক জন সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসক, আর দুই জনের মধ্যে এক জন ঐ বালকের পিতা ও এক জন তাহার ভ্রাতা, তবে আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হয়, ঐ কর্ম্ম বালকের আপাততঃ ক্লেশকর বটে, কিন্তু তাহার হিতার্থেই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তখন আর ঐ তিন ব্যক্তিকে নিন্দা না করিয়া বরঞ্চ বালকের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপে পরমেশ্বর সমস্ত দুঃখই সংসারের হিতাভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন। তিনি সমুদায় নিয়মই আমাদের সুখদায়ক করিয়াছেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে সমস্ত দুঃখ ঘটনা হয়, তাহাও আমাদিগকে নিয়মানুগামী করিবার নিমিত্তেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সে দুঃখও মোচন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় কৌশলই শুভ কৌশল, এবং চরমে সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিয়মানুগত কার্য্য করাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম ও সুখের নিদান। জগদীশ্বর মনুষ্যকে কিরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার কিরূপ শুভকর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অস্থি, মাংস, রক্ত, নাড়ী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যে যে বস্তু দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ভৌতিক পদার্থ, ও ভৌতিক নিয়মের অধীন। ('বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' থেকে গৃহীত)

বাম-কংগ্রেসের বিপুল ভোট এবার গৈরিকেই

শুভময় মৈত্র

আভাস তো ছিল অনেক দিন ধরেই। গত ২০১৪ লোকসভা এবং ২০১৬ বিধানসভাতে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের ভোট শতাংশ যোগ করে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। তবে তার পর থেকে বিভিন্ন উপনির্বাচনে বিজেপি উঠে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে। শেষ পর্যন্ত এ বারের বুথফেরত সমীক্ষায় বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের জনসমর্থন পাঁচ থেকে সাত শতাংশ দেখানো হলেও সেটা মানতে চাইছিলেন না পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় অংশের মানুষ। তবে এ বারের ভোটফলে সেই চিত্র প্রায় পরিষ্কার। মোটের ওপর বামফ্রন্ট আর কংগ্রেস শতাংশের হিসেবে সাতে-পাঁচে ছাড়া আর কোথাও নেই। পাটিগণিতের হিসেবে যোগ করলে হয় বারো, আর সেখানে আগের বিধানসভার হিসেবে দু'দল মিলিয়ে ভোট কমেছে প্রায় আঠাশ শতাংশ। সেই আঠাশের প্রায় পুরোটাই বিজেপিতে যোগ হয়ে তাদের দশ শতাংশকে পৌঁছে দিয়েছে আটত্রিশে। তৃণমূল শেষ বিধানসভায় পেয়েছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ শতাংশ। সেখান থেকে তাদের ভোট কমেছে সামান্য। তবে সেটুকুও গেছে বিজেপিতে। সব মিলিয়ে তাই তৃণমূল আর বিজেপির ভোটের ব্যবধান পাঁচ শতাংশের নীচে নেমে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আসনের হিসেবে প্রচুর ওলটপালট হয়। সেটাই হয়েছে। অর্থাৎ বামফ্রন্ট সমর্থকদের বিজেপি অভিযান সম্পন্ন, পিছিয়ে থাকেনি কংগ্রেসের ভোটাররাও।

ভোটের ফল একটা সারমর্ম বিশেষ। সেখানে সামান্য আসনের হিসেব ছাড়া আর কিছুর গুরুত্ব নেই। তার থেকে একটু বড় ভাবনা ভোট শতাংশ। কিন্তু সব থেকে গভীরে থাকে কয়েক কোটি মানুষের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা, এবং বিভিন্ন কারণ। যত চাপেই মানুষ থাকুক না কেন, নিজেদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সচেতন। সেই হিসেবে একটা কথা বারবার উঠে আসছে। তা হল গত বেশ কয়েকটি উপনির্বাচন এবং সর্বোপরি পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাঁরা নিজের ভোট নিজে দিতে পারেন নি, তাঁরা এবার ক্ষোভ উজাড় করে দিয়েছেন বিজেপিকে নিজের দল ধরে নিয়ে। তবে এটাই হয়তো একমাত্র কারণ নয়। গ্রামবাংলার তৃণমূল-বিরোধী মানুষেরা হয়তো তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে সুরক্ষার স্বার্থে বেছে নিয়েছেন বিজেপিকে, যেখানে বামফ্রন্ট কিংবা কংগ্রেস তাঁদের নেতৃত্ব দিতে পারছিল না। যেহেতু বাংলায় রাজনীতি সংক্রান্ত লড়াইয়ের তীব্রতা অনেক বেশি, তাই সর্বভারতীয় দল হিসেবে বিজেপিই হয়ে উঠেছে তৃণমূল-বিরোধীদের স্বাভাবিক পছন্দ। এর সঙ্গে আছে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন। সংখ্যালঘুরা সাধারণ ভাবে তৃণমূলের পক্ষেই ছিলেন। সেই অঙ্কে সংখ্যাগুরুদের একটা বড় অংশ এ বার সমর্থন করেছেন বিজেপিকে। আর উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জায়গায় সংখ্যালঘুদের ভোট বামফ্রন্ট, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার সুবিধেটাও পেয়েছে বিজেপি।

এ সব তো গেল অতি-পরিচিত কিছু বিশ্লেষণ। কিন্তু সঙ্গে যে প্রশ্নগুলো বারবার আসবে, তা হল বাম আর কংগ্রেস আলাদা লড়াতেই কি মানুষ তাদের ওপর বিশ্বাস হারালেন অনেকটা? তারা একসঙ্গে থাকলে কি তাদের সমর্থকদের আত্মবিশ্বাস বাড়ত? সে ক্ষেত্রে কি তাদের ভোট শতাংশ পাটিগণিতের সাত আর পাঁচ যোগ করে বারো শতাংশের থেকে বেশি হত অনেকটা? এ প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু খুব ইতিবাচক নয়। যাদবপুরের মতো কেন্দ্রে বাম প্রার্থী এত খারাপ ফল করলেন কিভাবে? সেখানে তো কংগ্রেসের সমর্থন ছিল। সেখানে তো বেশির ভাগ মানুষ শহুরে। তাই সম্প্রদায়গত বিভাজন ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, এই ধরনের অতি সরলীকরণ এ ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া শক্ত। উত্তরবঙ্গেও দু-একটি আসনে বামেরা সমর্থন করেছিল কংগ্রেসকে। সেখানেও অবস্থা তথৈবচ। ২০১৬-তে বামেদের যে ভোট জোট হওয়ার কারণে ভালো ভাবে ঘুরেছিল কংগ্রেসে, এ বার সে চিত্র সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই এ প্রশ্ন বারবার উঠবে যে তৃণমূলকে হারাতে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস কি তাদের ভোট সচেতন ভাবে হাতবদল করল বিজেপিতে? নাকি সাধারণ সমর্থকরা স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন তাদের দিক থেকে?

সামনে কলকাতা পুরসভা নির্বাচন, ২০২০ সালে। আর তার পরের বছর ২০২১-এ রাজ্যের বিধানসভা ভোট। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এ রাজ্যে ছোট, বড়, মাঝারি নেতাদের দলবদল অব্যাহত। সেই নিয়মে আগে তৃণমূলের লাভ হলেও, এখন সেখান থেকে ফসল তুলছে বিজেপিও। রাজ্যে তাই আপাতত আলোচনা যে তৃণমূল থেকে আরও কত নেতা বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন। এটা পরিষ্কার যে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া নেতারা সংগঠনে যেমন সাহায্য করেছেন, তেমনই ভোট জোগাড়ও করেছেন অনেকটা। ভোট করানো অবশ্যই সংসদীয় গণতন্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাতে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি ২০১৯-এ সফল। এই হাওয়া বজায় রাখলে সামনের দিনে লড়াই আরও জমবে। তবে বামপন্থী কিছু মানুষের আশা, তৃণমূল দুর্বল হয়ে বিজেপি যদি রাজ্যে আরও শক্তি বাড়ায়, তখন সাংগঠনিক সমস্যায় পিছিয়ে পড়বে তৃণমূল। সেই পরিস্থিতিতে মানুষ আবার ফিরতে পারেন বামফ্রন্ট বা কংগ্রেসের দিকে। সামনের দিনগুলোতে তাই কার ভোট কোন দিকে যায় সেটাই দেখার। বামফ্রন্ট আর কংগ্রেসের এই অল্প পরিমাণ ভোট এর পর আর অন্য দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। তাই পরবর্তীকালে তৃণমূল বা বিজেপির মূল লক্ষ্য থাকবে তাদের প্রাপ্ত ভোটটুকু ধরে রাখার। কিন্তু জনগণের মতামত যেহেতু চিরপরিবর্তনশীল, তাই এ বারের ভোট শতাংশ সামনের দিনগুলোতে আরও বদলাবে। উত্তর কলকাতা, দক্ষিণ কলকাতা এবং যাদবপুরে ক্ষমতা ধরে রেখেছে তৃণমূল। তাই পুরসভা ভোটে ছবি পাল্টায় কিনা সেটাই আগে দেখার। সেখানে বিজেপির ভালো ফল কিন্তু বুঝিয়ে দেবে যে বাম-কংগ্রেসে সহজে ফিরছেন না মানুষ। বিধানসভা নির্বাচন তখন পুরোপুরি দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্যবসিত হবে।

লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতায় শিক্ষক। মতামত ব্যক্তিগত

এএনআই

একজনই রক্ষাকর্তা?

অরুণা রায়

এ লেখা যখন লিখছি, তখনও পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ ঘোষিত হয়নি। তবে ট্রেন্ড থেকেই স্পষ্ট বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ আরও এক দফা ক্ষমতায় আসতে চলেছে। প্রশ্ন হল, আমাদের ভারতবাসীর কাছে এর অর্থ কী?

'হিন্দুত্ববাদী ভারত'-এর একটি আগ্রাসী রূপের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যেতে হবে আমাদের। এই 'হিন্দুত্ববাদী ভারত'-এ ধর্মীয় পরিচয়-ভিত্তিক অসাম্য তৈরি হবে। আমাদের আরও একটা জিনিসের জন্য তৈরি হতে হবে — সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং রীতিনীতিকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে উচ্চবর্গের জাতপাত-ভিত্তিক অসাম্য সৃষ্টিকারী সামাজিক পরম্পরা এবং বৈষম্যের সঙ্গে। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে যে তফাৎ দ্রুত বাড়ছে, কর্পোরেটগুলির সঙ্গে বিজেপি-র ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফলে তা দ্রুততর হবে। এবং অর্থনীতিতে বাজার-কেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর ধারণাটি বাতিল হবে। চলবে 'বাজার-বন্ধু' শাসন, যার আসল অর্থ বেসরকারিকরণ বাড়বে। তার ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সহ যাবতীয় মৌলিক পরিষেবা আরও মহার্ঘ্য হবে এবং তা পাওয়া মানুষের পক্ষে কঠিনতর হয়ে পড়বে। সম্ভবত মহিলাদেরও পুরুষতন্ত্রের দাপট স্বীকার করে নিতে হবে। এক জন নেতাই সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন, এ ধারণাটাই গণতন্ত্রের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। সম্মিলিত নেতৃত্ব এবং দায়বদ্ধতার প্রতি গণতান্ত্রিক বিশ্বাসটিকেই তা দুর্বল করে দেয়। এটি রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের পূর্বলক্ষণ, যা ভারতে ক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টনের ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর।

ভোটের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় ভারতের মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পন্থা হিসেবে 'ম্যাচো' ভাবমূর্তিকে সমর্থন করার পন্থাটিই বেছে নিয়েছেন। 'ঘরে ঢুকে মেরে এসেছি' আওয়াজ তুলে যে রকম আগ্রাসী ভাবে বালাকোটের সার্জিকাল স্ট্রাইক-কে জনপরিসরে হাজির করা হয়েছিল, তা শুধু আগ্রাসনকেই জনপ্রিয় করে তোলা নয়, তা আমাদের মধ্যের নীচতম প্রবৃত্তিকে উসকে দিয়ে ভোট চাওয়া। সন্দেহাতীত ভাবে নৈতিক মানদণ্ড নীচে নেমে গিয়েছে — নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়েছে হিংসাত্মক অপরাধীদের, জাতির জনকের হত্যায় আনন্দ প্রকাশ করতে যাঁদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় না। এই সব অসদুক্তি ভোটারদের বিমুখ করা কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার পরিবর্তে তা ক্ষুদ্র ক্ষমতার প্রতি তাঁদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের পারফরমেন্স বিচার করে মনে হচ্ছে যেন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষদের গণপিটুনিতে হত্যা তেমন উদ্বেগের কোনও বিষয়ই নয়।

কংগ্রেসের বিষয়ে বলব, গ্রহণযোগ্য দল হিসেবে নিজেদের নতুন করে গড়তে ব্যর্থ হয়েছে কংগ্রেস। দলীয় কোন্দলে ভুল প্রার্থী নির্ধারণ করার ফলে বহু আসন হারাতে হয়েছে। আবার শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থে জোটকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল স্তরে কোনও প্রচারও করা হয়নি। অনেক সময়ই যে সব ক্ষেত্রে কৃতিত্ব মোটেই বিজেপির নয় সে সব ক্ষেত্রে বিজেপি কৃতিত্ব জাহির করেছে, আর নীরব থেকেছেন কংগ্রেসের নেতারা। আরএসএস-এর যে চিন্তাধারা ও চর্চা সেটাই প্রধান হয়ে উঠে এসেছে, তার কারণ এই নয় যে কংগ্রেসের বক্তব্য দুর্বল এবং প্রভাবহীন ছিল, আসলে কংগ্রেসের স্রেফ কোনও বক্তব্যই ছিল না।

শহিদদের স্মরণে নবীন ভোটারদের ভোট চাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী যে ভাবে পুলোয়ামার মোটিফটিকে ব্যবহার করেছেন দেশের সেনাবাহিনীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক ইঙ্গিতবাহী। দেশের নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশন আজ গভীর প্রশ্নের মুখে। ইভিএম নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, এটির মাধ্যমে ভোট নেওয়ার প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ নয়। অন্য দিকে ভিভিপ্যাটে নিজস্ব ভোট কোথায় পড়ল তা দেখতে পান ভোটাররা, কিন্তু ভোটগণনার জন্য সেটি ব্যবহার করা হল না। সুপ্রিম কোর্ট 'অডিটিং'-এর জন্য মাত্র ২ শতাংশ ভিভিপ্যাট ভোট গোনার অনুমতি দিয়েছে।

হ্যাঁ, বিজেপি জিতেছে। কিন্তু সসম্মানে নয়।

লেখক সমাজকর্মী

দলিত দেশের সব চেয়ে বেশি দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ থাকেন পাঞ্জাবে। এ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং তামিল নাড়ুতেও দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছেন। এ বারের লোকসভা ভোটে পাঞ্জাবের দলিত অধ্যুষিত এলাকায় কয়েকটি আসন বিজেপি ও শিরোমণি আকালি দল পেলেও বেশির ভাগ আসনই পেয়েছে কংগ্রেস। অন্য দিকে, উত্তর প্রদেশে দলিত অধ্যুষিত এলাকায় যে আসনগুলিতে বিজেপি ছিল, এ বারেও তার তেমন ব্যত্যয় হয়নি। পশ্চিমবঙ্গেও ওই এলাকাগুলিতে বিজেপির উত্থান চোখে পড়ার মতো।

মুসলমান মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলির অনেক জায়গাতেই বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের যে আসনগুলি একদা বিজেপির জোটসঙ্গী পিডিপির দখলে ছিল, সেগুলি এ বার ন্যাশনাল কনফারেন্সের দখলে। যদিও দু'টি কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতা ধরে রেখেছে। তবে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তরপ্রদেশ। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যে আসনগুলি বিজেপির দখলে ছিল, তার বেশিরভাগেই বিজেপি-বিরোধী ভোট পড়েছে। অসমেও বেশ কয়েকটি আসনে রদবদল হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের দু'টি কেন্দ্রে বিজেপির জয় উল্লেখযোগ্য।

আদিবাসী দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ভোটের ফলে আগের বারের থেকে এ বারে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। বেশির ভাগ আসনই বিজেপির দখলে। তবে ত্রিপুরায় দু'টি কেন্দ্রে বামেদের হারিয়ে বিজেপির আসা উল্লেখযোগ্য। ঝাড়খণ্ডের দুমকা ও ওড়িশার কালাহান্ডি আসন দু'টিও এ বার বিজেপির। ব্যতিক্রম সিংভূম কেন্দ্র। অরুণাচল পূর্ব কেন্দ্রটিতে এ বার বিজেপি। বোঝাই যাচ্ছে, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তাদের শক্তি অনেকটাই বেড়েছে। তবে ছত্তিশগড়ের বস্তারে বিজেপিকে সরিয়ে কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসা তাৎপর্যপূর্ণ।

আগ্রাসী প্রচারে ব্যর্থ কংগ্রেস

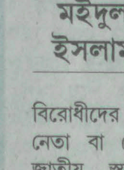

মইদুল ইসলাম

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না। এই ভোটে মানুষ একটা শক্তিশালী ও নির্ণায়ক নেতৃত্ব চেয়েছিল। তুলনায় বিরোধীদের মধ্যে কোনও একজন নেতা বা নেত্রী ছিলেন না যিনি জাতীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন। ২০১৪ সালের মতো ২০১৯ সালের নির্বাচন আসলে মোদীত্বের দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের জয় হল। পৃথিবীজুড়ে দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তাবাদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আমেরিকা, ইউরোপ, তুরস্ক, রাশিয়া এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ভারতে তা মোদীত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

মোদীত্বের রাজনীতি আসলে হিন্দুত্বের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে নতুন করে কল্পনা করা, প্রতিরক্ষা-কেন্দ্রিক দেশপ্রেম, নিজের পিছিয়ে পড়া জাতিগত শ্রেণি এবং গরিব পরিবার থেকে আসার পরিচিতিগুলো সুচারু রূপে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কৌশল। কংগ্রেস দুর্নীতির বিরুদ্ধে খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রচার করতে পারেনি। ন্যায় প্রকল্প এবং বেকারত্ব নিয়ে যে আগ্রাসী প্রচার করার দরকার ছিল তার তুলনায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

বাংলায় বামফ্রন্টের ভোট বিজেপির দিকে গেছে। এই প্রবণতা ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং গত তিন বছরে বিভিন্ন উপনির্বাচনে দেখা গিয়েছিল। উপরন্তু একটি লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভা নির্বাচনের মতো স্লোগান দেওয়াতে বিজেপি-বিরোধী ভোট যেটা বামফ্রন্ট পেতে পারত সেটাও তারা পেল না। বরং নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হল বাংলার বামফ্রন্ট। ইতিহাস তাদের আগেও ক্ষমা করেনি ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে, আর এ বারও ক্ষমা করবে না। তৃণমূলের ভোট ২০১৬ বিধানসভা থেকে কমেনি এবং ২০১৪ সালের লোকসভার তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট নিজেদের জামানত রাখতে পারবে না, এটা ক'জন বুঝেছিল?

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কলকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

নির্বাচন ও আত্মঘাতী বামপন্থী

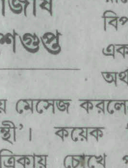

রাজর্ষি দাশগুপ্ত

নীরদবাবু বলেছিলেন আত্মঘাতী বাঙালি। লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে বামেদের বিপর্যয় দেখে এক বয়োজ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ আমায় মেসেজ করলেন, 'আত্মঘাতী বামপন্থী'। কয়েক দিন থেকেই পত্রপত্রিকায় চোখে পড়ছিল এমন একটা সম্ভাবনা। বামফ্রন্টের সমর্থক কর্মীদের এক বিপুল অংশ বিজেপি-র দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, উদ্দেশ্য তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়া। যাকে আমরা বলে থাকি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ। চৌত্রিশ বছর ধরে কঠোর অনুশাসন মেনে চলা ক্যাডার ভিত্তিক বামপন্থী পার্টি কর্মীদের পক্ষে এমনটা সম্ভব, ভেবে নেওয়া কষ্টকর। অথচ ফলাফল থেকে এটা পরিষ্কার যে ঠিক এমনটাই ঘটেছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে বিজেপি-র বিপুল উত্থান চোখে পড়ছে তার পিছনে বামপন্থী ভোটের ভূমিকা যথেষ্ট। ঠিক যে ২৩ শতাংশ ভোট বিজেপির ঝুলিতে বেড়েছে, সেই তেইশ শতাংশ ভোট ২০১৪ সালে বামেদের পক্ষে পড়েছিল, অপর দিকে তৃণমূলের ভোটের শতাংশ একই আছে। তৃণমূলকে শিক্ষা দিতে গিয়ে এ রাজ্য থেকে বামেরা নিজেদের মুছে দিয়েছে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে শাসন করার পর এ রাজ্যে, অন্তত সিটের হিসেবে, বামপন্থীরা নিশ্চিহ্ন। এবং তার পিছনে তাঁদের নিজেদের কৃতিত্ব কম নয় এ কথা স্পষ্ট। ত্রিপুরায় হারের পর কেরালায় কোণঠাসা অবস্থা সামলে কোনও মতে বাংলায় অস্তিত্বের লড়াইটুকু টিমটিম করে চলছিল। এইবার সেইটুকুও গেল, ভিয়েতনাম ছেড়ে জয় শ্রীরাম সম্বল করে যত দিন চলে।

একশো বছর আগে যে অঞ্চলে কমিউনিস্ট রাজনীতির জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং গণআন্দোলনের রাস্তা ধরে ক্ষমতায় আসা, যেখান থেকে একের পর এক সর্বভারতীয় নেতৃত্ব উঠে এসেছে, দেশভাগের ভয়াবহ ক্ষত সত্ত্বেও যেখানে হিন্দুত্ব শিকড় গাড়তে পারেনি, সেখানে বামপন্থার এই ভয়াবহ সংকটের কারণ কী তা নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সময় এবং ধৈর্য নিয়ে ভাবা দরকার। তবে তাৎক্ষণিক ভাবে, এই সংকটের পিছনে দু'টি কারণ তুলে ধরা যায়। প্রথমত, মতাদর্শগত দুর্বলতা। তৃণমূলকে শিক্ষা দেবার জন্য বিজেপি-কে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে এটা পরিষ্কার যে বামপন্থীরা, অন্তত কর্মী সমর্থকদের একটা বড় অংশ, শত্রুপক্ষের শিবিরে কারা বড় শত্রু আর কারা তত বড় নয় এই বিভাজনটা করতে ভুলে গেছে। চৌত্রিশ বছর ধরে শাসনের অভ্যাস তাদের কাছে ক্ষমতার বোধটা যত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে, ক্ষমতা কেন প্রয়োজন, সেই বোধটা ততটাই অস্পষ্ট করে দিয়েছে। যে কোনও মূল্যে ক্ষমতা চাই— একদা এই অবস্থানকে যারা বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত করত, এখন তারা নিজেদের অবস্থানকে আলাদা করতে ভুলে গেছে। দ্বিতীয়ত, বামপন্থীরা বরাবরই মনে করে এসেছে যে তাদের রাজনীতির জোর বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ভিত্তি করে। এক অর্থে এই ধারণা ভুল নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে এই দেশে, বিশেষ করে এই অঞ্চলে বামপন্থার ইতিহাস দেখলে যেটা পরিষ্কার বোঝা যায় সেটা হল সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিতে বামপন্থী ধ্যানধারণার প্রভাব ও বিস্তার। সাতাত্তর থেকে যে বামফ্রন্টের নির্বাচনী আধিপত্য চলেছে তার জমি অনেকটাই তৈরি হয়েছিল তিরিশ এবং চল্লিশ দশকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাত ধরে। বিশেষ করে প্রগতিশীল লোকসংস্কৃতি এবং মধ্যবিত্তের কৃষ্টিচর্চায় এই ভাবেই গড়ে ওঠে বামপন্থী চেতনার আধিপত্য এবং রাজনীতির বীজ। বামপন্থার দুর্ভাগ্য যে আজকের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ, কর্মীদের কথা ছেড়েই দিন, এই ইতিহাস বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছেন। মতাদর্শ এবং দৈনন্দিন সংস্কৃতি নিয়ে বরং যত্নশীল বিজেপি। বামপন্থীরা, নীরদবাবুর বাঙালির সূত্র ধরে, আত্মবিস্মৃত এবং আত্মঘাতী। আমরা এখন অবিচুয়ারি লিখি।

বিসিসিএল

লেখক জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

চিঠি লিখুন এই ঠিকানায়— প্রতি সম্পাদক, এই সময়, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, নবম তল, ৪১ এ, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০১৭। ফ্যাক্স: ০৩৩-৬৬০৩১৩৭৮। ই-মেল: eisamay@timesgroup.com
নিজের মত জানান ফেসবুক-এ। লগ ইন করুন: www.facebook.com/eisamay.com
আমাদের G+-এ ফলো করুন: google.com/+EisamayOfficial